বিভিন্ন শিক্ষাভাবনা ও ভগিনী নিবেদিতা

গৌরী ভৌমিক

শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সভ্যতার অন্যতম শর্ত। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা জীবনের সমব্যাপী—'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। এই জীবনব্যাপী শিক্ষাপ্রক্রিয়ার অন্যতম স্তম্ভ হল প্রথম জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, যা ব্যক্তির উত্তরজীবনে জীবিকা অর্জন, রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালন, সুসংহত সমাজগঠন, মননশীলতার পরিচর্যা, নান্দনিক চেতনার প্রকাশ ও তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসঞ্জাত প্রশ্নগুলির সমাধানে সহায়ক হয়।

বিভিন্ন যুগে প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। আদিম মানুষের শিক্ষা ছিল সরল, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক ফলাফলভিত্তিক। কিন্তু মানুষের দ্রুত ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় কৌশল, নতুন নতুন চিন্তাপ্রসূত ভাববৈচিত্র্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান মানুষের জীবনে এতটাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, প্রয়োজন হয় সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। ভারত, গ্রিস ও মিশরেই সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। এরপর আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার ক্রমবিবর্তিত সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গড়ে ওঠে নানা প্রকৃতির বিদ্যায়তন। যদিও মানবশিশুর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য বিদ্যায়তন ছাড়াও পরিবার, সমাজ, এবং আধুনিক জনসংযোগমূলক বিভিন্ন মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম, তবুও জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষার অপরিহার্যতা অবশ্যস্বীকার্য।

শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে মতভেদ না থাকলেও তার লক্ষ্য দেশ-কাল ও প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি। যে-বিদ্যা এই মুক্তিলাভের সহায়ক, তাকেই প্রকৃত বিদ্যা বলে মনে করা হত, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। মিশরীয় সভ্যতায় ব্যক্তির প্রয়োজনের চেয়ে সামাজিক প্রয়োজনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক শিশুকে সামাজিক শ্রেণি অনুযায়ী বৃত্তিমুখী শিক্ষা দেওয়া। প্রাচীন চিন সভ্যতায় শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল প্রচলিত রীতিনীতি ও অনুশাসনগুলির অনুশীলন। শিশুর নিজস্ব সত্তার কোনও মূল্য ছিল না। আবার প্রাচীন গ্রিসে সোফিস্ট শিক্ষকরা ছিলেন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ। ব্যক্তির নিজস্ব বিচার-

বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাই সকল সত্যাসত্যের মাপকাঠি। কোনও সর্বজনীন সামাজিক অনুশাসন তার নিয়ামক হতে পারে না। পরবর্তী কালে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক মনীষী এই উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ সমর্থন না করলেও ব্যক্তিসত্তার অবাধ বিকাশের লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছিল এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা। পাশাপাশি অপর গ্রিক রাষ্ট্র স্পার্টায় শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল দৃঢ় ও সুসংহত রাষ্ট্রজীবন গঠন করা। ব্যক্তির রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তার কোনও স্বীকৃতি ছিল না। প্রাচীন রোমের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল এই গ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ। কিন্তু কৃষিভিত্তিক রোমান সভ্যতায় বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। কাজেই তাদের শিক্ষা ছিল জীবনমুখী।

গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইওরোপের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়। খ্রিস্টধর্মের অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার নিয়ামক হয়েছিলেন গোঁড়া ধর্মোৎসাহী যাজকবৃন্দ। তাঁদের পরিচালনায় শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি ও আচরণের অনুশীলন। মনে করা হত, শিশু জন্মায় এক আদিম পাপপ্রবৃত্তি নিয়ে। কঠোর অনুশাসনের দ্বারা তার স্বাভাবিক গতিবিধিকে অবরুদ্ধ করে এক সুনির্দিষ্ট গতে বাঁধা পথে তাকে চলতে বাধ্য করাই শিক্ষার লক্ষ্য। সেইসঙ্গে ছিল শিশুকে নানারকম তাড়না ও দৈহিক নির্যাতন। এইসময়কার শিশু বিদ্যালয়গুলির নির্মম নৃশংস পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায় ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসে।

এই প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বজ্রআঁটুনি থেকে শিশুকে মুক্ত করার প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হল সংস্কার আন্দোলনের যুগে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রোমান শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়ন-এর নাম। তিনি তাঁর লেখায় শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সাভিনিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষাকে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার কথা বলেন, বিদ্যালয়-শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন এবং দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধিতা করেন।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল

ক্রমশ এই সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠল মানবতাবাদ। মানবতাবাদী শিক্ষকদের অন্যতম ইরাসমাস। এঁদের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকারী মানুষ গড়ে তোলা, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া। সপ্তদশ শতাব্দীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাস্তববাদী আন্দোলন। বাস্তববাদী শিক্ষাবিদদের অন্যতম কমেনিয়াস। তিনি সর্বপ্রথম শিশুশিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। মূর্ত বস্তুকে অবলম্বন করে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী ও সহজতর পদ্ধতিতে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কথা তিনি বলেন এবং

শিশুদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেন।

আধুনিক যুগে ব্যক্তির বহুমুখী সত্তার বিকাশ অপরিহার্য হয়ে ওঠায় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রাণীর আচরণমাত্রই হল তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের চেষ্টা, যা তার পৃথিবীতে টিকে থাকারও অন্যতম শর্ত। এই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে প্রাণী যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা-ই হল শিক্ষা।

সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ চরিত্র। আধুনিক শিক্ষাবিদরা সকলেই তাই ব্যক্তির নৈতিক মানোন্নয়ন ও আদর্শ চরিত্রগঠনকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার এই দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোও বলেছিলেন, শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকবে না, যা নৈতিক গুণাবলির বিকাশকে ব্যাহত করে। আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষার এই নৈতিক লক্ষ্যের প্রবক্তা হার্বার্ট। স্বামী বিবেকানন্দও 'মানুষ গড়া ও চরিত্রগঠন'কে শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করেছেন।

নৈতিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্তার উন্মোচনকেও আদর্শবাদীরা শিক্ষার লক্ষ্য বলে মতপ্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি সকলেই একমত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার বিকাশসাধন। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক ফ্রয়েবেলও শিশুর শিক্ষাকে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধির লক্ষ্যে চালিত করেছেন। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ টমাস শীল্ড বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল রক্তমাংসের শিশুকে ঐশীসত্তাসম্পন্ন করে তোলা। ড. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, মানুষের অন্তরে বুদ্ধির অগম্য যে-সত্তা আছে, তাকে উপলব্ধি করা। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও (১৯৬৪-৬৬) এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদ শিক্ষা বিষয়ে আধুনিক ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। আধুনিক শিক্ষাভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য শিশুকেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুরই সর্বাধিক গুরুত্ব। তার চাহিদা, সামর্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ফরাসি চিন্তাবিদ রুশো। তিনি তাঁর 'এমিল' উপন্যাসে কাল্পনিক শিশু এমিল-এর শিক্ষাকে কেন্দ্র করে স্পষ্টভাবে তাঁর শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদর্শ ও সার্থক শিক্ষা। শিশুর জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হল প্রকৃতি। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

রুশোর চিন্তাধারা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার আধুনিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুগামীরা এই তত্ত্বকে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় যথার্থ পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। এঁদের মধ্যে পেস্টালৎসি অন্যতম।

পেস্টালৎসি মনোবিজ্ঞানের পাঠ না নিলেও শিশুদের সমস্যা অনুভব করেছিলেন। তিনি রুশোর 'এমিল'-এর আদর্শে নিজের সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, নিজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন এবং

শিক্ষাবিষয়ে কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা। শিশুমনকে ভালভাবে জানা এবং তার মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন। দ্বিতীয়ত শিক্ষাকে তিনি সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছেন, যা শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজেও কল্যাণকর সংস্কার ও পরিবর্তন নিয়ে আসে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, মানবতার আবেদন। পেস্টালৎসির মানবতাবাদী জীবনদর্শন তাঁর শিক্ষাচিন্তাকেও প্রভাবিত করে। রুশোর প্রগতিশীল শিক্ষাভাবনা কেবল পুরুষশিশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পেস্টালৎসি শিশুকন্যা, দরিদ্র, অবহেলিত, ক্ষীণবুদ্ধি—সকল স্তরের সকল মানবসন্তানের শিক্ষার অধিকারকে স্বীকার করেছেন। এখানেই তিনি সবচেয়ে আধুনিক। তিনি নিজে নিউহফ নামক স্থানে স্কুল খুলে স্নেহপূর্ণ ও দরদি মন নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লিওনার্ড অ্যান্ড গারট্রুড'-এ তিনি বলেন, যারা দুঃখী, তাদের তিনি ভালবাসেন এবং তাদের মঙ্গলসাধনই তাঁর জীবনব্রত। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশপ্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ। পেস্টালৎসির মতে, আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তির স্বাভাবিক প্রগতিশীল ও সুষম বিকাশ। শুধুমাত্র বই পড়ে বা তথ্য আহরণে এই শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে না। শিশুরা কিছু জ্ঞান আহরণ (To learn something) করবে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাদের কিছু হয়ে উঠতে (To be something) হবে। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির প্রথাবদ্ধ কৃত্রিম কঠোর বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ পরিবেশের পরিবর্তে প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ এক সহজ পরিবেশ, যেখানে বিকাশোন্মুখ শিশুকলিটি তার সমস্ত সুরভি নিয়ে ফুটে উঠতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ''I wish to psychologize education.''

শিশুপ্রেমী শিক্ষাবিদরা পেস্টালৎসির এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষণে আগ্রহী হন এবং এই নতুন আদর্শে স্কুল গড়ে তোলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক জন হার্বার্ট। রুশোর প্রকৃতিবাদ এবং আধুনিক পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি শিক্ষাকে এক দার্শনিক ভিত্তি দান করেন এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেন।

হার্বার্টের আত্মবীক্ষণতত্ত্ব আধুনিক শিক্ষা-ভাবনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এই তত্ত্বের প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষক শিশুমনে আগ্রহ বা প্রেরণা (Motivation) সৃষ্টি করতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহকে হার্বার্ট সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

হার্বার্টের সবচেয়ে বড় অবদান, তিনিই প্রথম শিক্ষার এক সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা হল, পাঠ্যবিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার আধুনিক আন্দোলনটিকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল-এর শিক্ষাভাবনা। তিনিও পেস্টালৎসির শিক্ষার নবীন আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভাববাদী। ভাববাদীদের মতে, জগতের সবকিছুর মধ্যে এক পরম আধ্যাত্মিক ঐক্য রয়েছে, মানবজীবনের লক্ষ্য তাকে উপলব্ধি করা। ফ্রয়েবেলের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্যও তাই। পাশ্চাত্যের এই ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ফ্রয়েবেল মনে করতেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিটি ভ্রান্ত, এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই তার

সর্বাধিক সংস্কার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জার্মানির ব্লানকেনবার্গ শহরে শিশুদের নিয়ে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল খোলেন। নাম দেন কিন্ডারগার্টেন (Kinder-garten) বা শিশুদের বাগান। তিনি 'স্কুল' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজস্ব শিক্ষা বিষয়ক মতামত সম্বলিত গ্রন্থ 'The Education of Man' প্রকাশিত হয়। ফ্রয়েবেলের মতে, শিশুর আত্মসক্রিয়তাই তাকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে। তারা আপনমনে খেলা, নাচ, গান, হাতের কাজ করবে। এই স্বাধীন সক্রিয় আচরণের মধ্য দিয়ে তারা ধীরে ধীরে উন্নততর আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই কিন্ডারগার্টেনে খেলাকে তিনি শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পরীক্ষা শুরু করেন। শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, বাগানের মালি যেমন সযত্ন পরিচর্যার দ্বারা চারাগাছগুলির স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে, শিক্ষকও তেমনিভাবে যথাযোগ্য পরিচর্যার দ্বারা শিশুর জীবনবিকাশের সহায়ক হবেন।

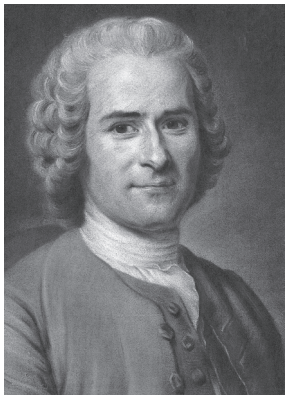

রুশো

হার্বার্ট

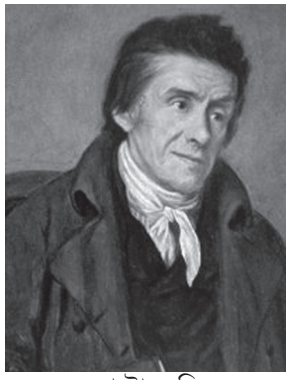

পেস্টালৎসি

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতো ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন, সমস্ত বিকাশের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তার অঙ্কুরের মধ্যে নিহিত থাকে। শিশুর মধ্যে তার ভবিষ্যৎজীবনের সমস্ত সম্ভাবনা বীজাকারে থাকে এবং বহির্মুখী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা উন্মেষিত হয়। কমেনিয়াসও এই অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিকাশের কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও শিক্ষাকে অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ বলেছেন। ফ্রয়েবেল এই বিকাশ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন উন্মেষণ (Unfoldment)।

কিন্ডারগার্টেনে সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকরণ গল্প বলা—যা শিশুর মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে, তাদের কৌতূহল উদ্রেক করে, ভাষা ও কল্পনাশক্তিকে পরিমার্জিত করে। প্রকৃতি-পরিচয়কেও ফ্রয়েবেল এই নতুন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্ডারগার্টেনকে শিশুর উপযোগী এমন এক ক্ষুদ্র সামাজিক পরিবেশের আদলে গড়ার কথা তিনি বলেছেন, যাতে শিশুরা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সামাজিকতা-মূলক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। তাঁর মতে, এর ফলে শিশু নিজেকে এক বিরাট একক সত্তার অংশরূপে অনুভব করতে পারবে। তাঁর বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণা লাভ করলেই শিশুর একাত্মতাবোধ জাগবে এবং সে সামাজিক হয়ে উঠবে।

পেস্টালৎসি, হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেলের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ পরীক্ষামূলকভাবে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এই নবতর শিক্ষাব্যবস্থাকে এক স্পষ্ট ও সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকায় ফ্রান্সিস পার্কার এক নতুন প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি তাঁর স্কুলে শৃঙ্খলারক্ষার গতানুগতিক কৃত্রিম পদ্ধতি পরিহার করে, স্কুলের পরিবেশটি যথার্থ সমাজধর্মী করে তুলতে আগ্রহী হন।

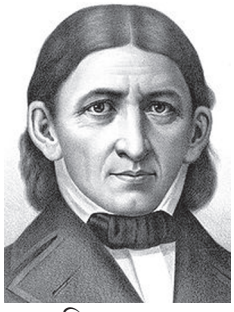

ফেড্রিক ফ্রয়েবেল

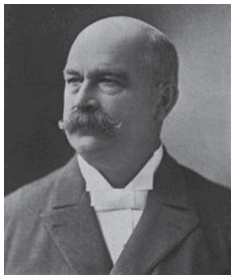

ফ্রান্সিস পার্কার

ফ্রান্সিস পার্কারের পর আমেরিকার প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর অনুগামী জন ডিউই। শিক্ষাকে তিনি জীবনযাপনের সঙ্গে সমার্থক করে তোলেন এবং আধুনিকতার দিশা দান করেন। দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয়, শিক্ষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক নির্ণয়, নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন, শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তাঁর শিক্ষাদর্শনকে পরবর্তী কালের শিক্ষানায়কদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছে।

শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডিউই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সত্য বা জ্ঞান কোনও নির্দিষ্ট বস্তু নয় যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে হাতে তুলে দিতে পারেন। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিজেই তা আহরণ করতে হয়।

ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য নিজেই 'ল্যাবরেটরি স্কুল' নামে একটি স্কুল খোলেন। এই স্কুলে চিরাচরিত প্রথার চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ দিয়ে সাজানো শ্রেণিকক্ষ, নির্দিষ্ট সময়ের পিরিয়ড, বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান, পাঠ্য বিষয়ের বিভাজন, বাঁধাধরা পঠন-লিখন কিছুই ছিল না। পাঠক্রম বলতে ছিল শিশুদের সৃজনধর্মী সক্রিয়তা যেমন খেলা, হাতের কাজ, প্রকৃতিবীক্ষণ ইত্যাদি এবং তার দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন।

ডিউই-র শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক তত্ত্বটিকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক 'প্রজেক্ট মেথড' উদ্ভাবন করেন, যা পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি' (Trial and Error) তত্ত্বকে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের একটি সমস্যা দেওয়া হয়। তারা চেষ্টা, ভ্রান্তি ও পুনঃপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার সমাধান করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বাভাবিক পরিবেশে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন করে। প্রজেক্ট শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্মপ্রেরণা জাগায়, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটায়। সমস্যা সমাধানের দলগত প্রচেষ্টা থেকে তারা পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা, সমবেদনা এবং অনুকরণের মতো সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে। তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ হয়।

এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইটালির মারিয়া মন্টেসরি প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নিজস্ব শিক্ষাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এক অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যা মন্টেসরি পদ্ধতি নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মন্টেসরি একজন মানসিক চিকিৎসক। কর্মসূত্রে তিনি দুই বিখ্যাত চিকিৎসক সেগুঁই (Seguin) এবং ইটরাড (Itrad)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং মানসিক ও দৈহিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেদের উন্নতির জন্য তাঁদের উদ্ভাবিত অভিনব পদ্ধতির সঙ্গে

পরিচিত হন। এই একই পদ্ধতি সুস্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা আরও অধিক ফলপ্রদ হতে পারে এই বিশ্বাস নিয়ে মন্টেসরি ১৯০৭ সালে রোমে 'চিলড্রেনস হাউস' নামে একটি স্কুল খোলেন।

স্কুলে শৃঙ্খলারক্ষার দমনমূলক গতানুগতিক পদ্ধতিকে মন্টেসরি পরিহার করেছেন। তিনি মনে করতেন এই ধরনের শৃঙ্খলা শিশুর মধ্যে জড়তা সৃষ্টি করে, তার মনকে অবদমিত করে, কর্মশক্তির বিনাশ করে, তার স্বাধীনতাকে হরণ করে। ফলে একে অতিক্রম করার এক গোপন ইচ্ছা শিশুমনকে তাড়িত করে। তাই কঠোর শাসনে শিশুকে শান্ত করে রাখার নামই শৃঙ্খলা নয়, শিশুর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হওয়া চাই।

মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল শিক্ষামূলক সরঞ্জামের উদ্ভাবন ও ব্যবহার। এগুলি শিশুর ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হয়, তার সৌন্দর্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে। মন্টেসরির স্কুলে লিখন, পঠন, গণিত ও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি উপযুক্ত শিক্ষাসরঞ্জামের ব্যবহারের দ্বারা শেখানো হয়।

মারিয়া মন্টেসরি

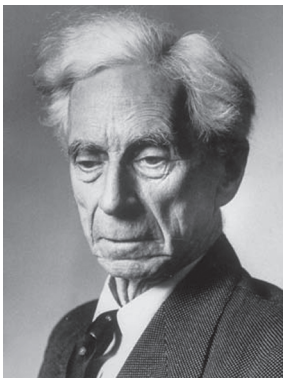

বার্ট্রান্ড রাসেল

রাজা রামমোহন রায়

সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক ধারণাগুলির অধিকতর স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন হয়। বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত যে সকল চিন্তাবিদ দর্শন, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মননের আলো ফেলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দার্শনিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করেন এবং অপেক্ষাকৃত বস্তুভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। শিক্ষা সম্পর্কেও মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর নীতিগুলিকে তিনি সুস্পষ্টতা দেন।

সুদীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনে অবদমিত হয়ে থাকার ফলে ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শিক্ষাভাবনার সূচনা হয় অনেক পরে। ঔপনিবেশিক শাসনের চূড়ান্ত অবহেলায় এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে, যার প্রত্যক্ষ ফল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়। প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাদীক্ষার অবনমন ঘটে। টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালাকেন্দ্রিক প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার ধারাটি লুপ্ত হতে থাকে। এইসময় ইংরেজ মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা শুরু করেন। ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায় একে স্বাগত জানান। তাঁর মনে হয়েছিল, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটলে কুসংস্কার দূর হবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোয় ভারতবর্ষও ইউরোপের উন্নত

দেশগুলির মতো প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক চিন্তাবিদরা দেশের জনগণের আদর্শ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিসন্ধিমূলক শিক্ষার জাঁতাকল থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে জাতীয় আদর্শের অনুকূল প্রকৃত শিক্ষার মুক্ত অঙ্গনে নিয়ে আসতে তাঁরা প্রয়াসী হন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ এঁদের অন্যতম।

স্বামী বিবেকানন্দ আর্ষদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সুদীর্ঘ পরাধীনতার পীড়নে ক্লিষ্ট ভারতবর্ষে মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সময় আসন্ন। ভারতীয় সমাজের পুনরুত্থানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং নারীশক্তির উজ্জীবন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা সকলপ্রকার বৈষম্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিশেষাধিকারকে অতিক্রম করে স্থির হয়েছিল 'মানুষ গড়া'-র লক্ষ্যে, যে-মানুষ চরিত্রবল, পরার্থপরতা ও সিংহসাহসিকতায় সমুজ্জ্বল। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তর্গত ব্রহ্মসত্তার বিকাশের প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন। ফ্রয়েবেলের মতো তিনিও মনে করতেন, জীবনের সকল সম্ভাবনার বীজ মানুষের অন্তরেই নিহিত। শিক্ষা হল তার ক্রম উন্মোচন। তাই তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''Education is the manifestation of perfection already in man.''

মহাত্মা গান্ধি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রশ্নে শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ নিজেকে দেশ গঠনের এবং পরিচালনের অন্যতম অংশীদার বলে ভাবতে পারবে। আর এর জন্য দেশবাসীর আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষার মান ও পদ্ধতি তাঁকে তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি এক বিশেষ ধরনের জনশিক্ষার পরিকল্পনা করেন, যাকে বলা হয় 'বুনিয়াদী শিক্ষা'।

আফ্রিকায় থাকাকালীন টলস্টয় ফার্মে তিনি এই নতুন ধরনের শিক্ষামূলক পরিকল্পনার সূচনা করেছিলেন। এখানে সবাই একই পরিবারভুক্ত লোকের মতো বাস করত এবং তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করত। ছাত্রদের দেহমনের বিকাশের জন্য তিনি তাদের নিয়ে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করতেন। কোনও পাঠ্য বই ছিল না। ছাত্রদের মানসিক বিকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় মুখে মুখে শেখানো হত। দৈহিক বিকাশের জন্য মাটি কাটা, লাঙল করা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কাজ নির্দিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর তিনি প্রথমে শবরমতীতে এবং পরে সেবাগ্রামে অনুরূপ আশ্রম তৈরি করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা ও তার সফল প্রয়োগ করেন।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারকে ভিত্তি করে তিনি ভারতবর্ষের জন্য এক নিজস্ব শিক্ষাভাবনার পত্তন করেছিলেন। দেশের নাড়ির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ইংরেজের গড়া শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি পছন্দ করেননি। তাঁর মতে, শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও জাতীয় সত্তার উন্নয়ন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে উন্মোচিত করা, আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করা, তাকে সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। অন্যান্য আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতোই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, নান্দনিক চেতনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে পারস্পরিক আন্তরিকতা এবং সামাজিক গুণাবলি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি ব্যাবহারিকজ্ঞানের আয়োজন করেছেন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তিনি মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভাগবত চতুষ্পাঠী, অ্যানি বেসান্ত ও মদনমোহন মালব্যের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু স্কুল এই সময়ে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই স্কুলগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিল্প কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা অথচ আস্তিক্যবাদ, ইংরেজিশিক্ষা, সমাজসেবা, মানবধর্মকে শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

এইসময়কার বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার ইতিহাসে জ্যোতিষ্কের মতো যে-নামটি আজও অম্লান, তিনি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, ভারতসেবার যূপকাষ্ঠে নিবেদিতপ্রাণ ভগিনী নিবেদিতা। পাশ্চাত্যের আধুনিক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা তাঁর হাত ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে এক নতুন দিশা লাভ করে। তাঁর শিক্ষাদর্শন ক্রমপরিণতি লাভ করেছিল প্রধানত এদেশের নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে। কর্মজীবনের শুরুতে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপ্রণালী প্রয়োগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে লাভ করা বৈদান্তিক প্রজ্ঞার প্রসাদ নিবেদিতাকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকেই মার্গারেট বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময়ে পেস্টালৎসি ও ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। প্রথাগত স্কুলে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি শিশুমনস্তত্ত্বের জ্ঞান আহরণ, শিশুকে সযত্ন পর্যবেক্ষণ, তার মনের স্বাভাবিক গতির অনুসরণ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লন্ডনের 'গুড সানডে' ক্লাবের সদস্য হওয়ায় তাঁর সুযোগ হয় বক্তৃতা ও রচনাপাঠের মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রকাশের। তিনি 'সিসেমি ক্লাব'-এ প্রথমে সদস্য ও পরে সেক্রেটারি হন। এখানে নিয়মিত শিল্প-সাহিত্য চর্চা, নারীজাতির নানাবিধ সমস্যা ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হত। বার্নার্ড শ, হাক্সলি প্রমুখ লেখক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রায়শই বক্তৃতা দিতেন। আধুনিক চিন্তাভাবনার আলোকে মার্গারেটের চিন্তাশীল ও উৎসাহী মন ক্রমশ বিশেষভাবে পরিণত হয়ে ওঠে।

১৮৯০ সালে ফ্রয়েবেলের শিষ্যা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মাদাম ডিলিউ-এর সঙ্গে মার্গারেট পরিচিত হন এবং দুজনে মিলে উইম্বলডনে একটি স্কুল খোলেন। চার থেকে ছয় বছরের জনা পঞ্চাশ শিশুকে নিয়ে সেখানে নতুন পদ্ধতিতে

পরীক্ষামূলক শিক্ষাদান শুরু হয়। স্থির হয়, পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপিয়ে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করা হবে না। শিশু তার আগ্রহ ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করবে। শিক্ষক কেবল তাকে পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা করবেন। পরবর্তী কালে এক ভাষণে মার্গারেট বলেন, ''শিশুর সবচেয়ে বড় শত্রু তাদের অতিবৎসল বাবা-মা, সন্তানকে যাঁরা আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে চান। আর শত্রু তাদের প্রথম শিক্ষকেরা, যাঁরা শিশুর প্রবণতা বোঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নিজের মনগড়া জীবনাদর্শ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন।'' ১৮৯২ সালে উইম্বলডনেই মার্গারেট কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির অনুসরণে নিজস্ব একটি স্কুল খোলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন শিল্পী এবেনজার কুক, যিনি রং-তুলির সাহায্যে ফ্রয়েবেলের পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ ও সাফল্য মার্গারেটকে শিক্ষিকা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম এনে দেয়।

১৮৯৫ সালে মার্গারেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় স্বামী বিবেকানন্দের। স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্যের ত্যাগ, সেবাপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার আদর্শ এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানৈষণা ও যুক্তিনিষ্ঠার সমন্বয়ে এমন এক আদর্শ নারীসমাজ গড়ে তুলতে, যারা সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে এক গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এই গড়ে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে নারীকে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই সময়ে এমন প্রতিভাশালিনী ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল। মার্গারেটের চরিত্রের সুকঠিন দৃঢ়তা, ঈশ্বরবিশ্বাস, ব্রতপালনের নিষ্ঠা, সর্বোপরি ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার অকুণ্ঠ প্রস্তুতি স্বামীজীর কাছে তাঁকে এ-কাজের জন্য যোগ্যতম করে তুলেছিল। স্বামীজী তাঁকে ভারতবর্ষে আসার আহ্বান জানান।

১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর কলকাতার বাগবাজারে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় নিবেদিতার নারীশিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষানিরীক্ষা। মাত্র দেড় বছর তিনি এই স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তার ব্যাপ্তি তাঁর জীবনব্যাপী। জনশিক্ষায় পঠন, লিখন ও গণিতের স্থান সর্বাগ্রে। জনসাধারণকে এইসব শিক্ষাদান করা প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের কর্তব্য বলে নিবেদিতা মনে করতেন। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে যেমন যুবকদের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর কর্মজীবনে প্রবেশের আগে তিন, চার বা পাঁচ বছর দেশের সামরিক বাহিনীতে কাজ করা বাধ্যতামূলক, ভারতের মতো অনুন্নত দেশে তেমনি শিক্ষার সৈন্যবাহিনী গঠন করা যায়, যারা শিক্ষা শেষ হলে ন্যূনতম তিনটি বছর জনশিক্ষার জন্য ব্যয় করবে। অন্যদিকে গ্রামবাসীরাও তাদের মধ্যে শিক্ষকরূপে অবস্থানকারী ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার নেবে।

নিবেদিতা দেখেছেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষাভাবনায় শিক্ষার্থীর যে-মানসিক বিকাশের কথা বলা হয়েছে, ভারতবর্ষ তার মূল্য আবিষ্কার করেছে অতি প্রাচীন কালেই। কোনও বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা করার আগে মনোযোগের শিক্ষা হিন্দুদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ ছিল। তাই এই বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের কাছে ভারতবর্ষের ঋণস্বীকারের কোনও প্রয়োজন নেই। এই ভারতীয় ভাবধারাকে অবলম্বন করেই ভারতবর্ষের জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে বলে নিবেদিতা মনে করতেন।

প্রথমে শিক্ষার্থীর অনুভূতিগুলিকে শিক্ষা দেওয়ার ওপর নিবেদিতা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহৎভাব অনুভব করতে শেখা, সদ্‌ভাব ও উচ্চভাব বেছে নেওয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পক্ষে হাজারগুণ গুরুত্বপূর্ণ, অন্য যে-কোনও শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনের চেয়ে। এই কারণে একজন নিরক্ষর জননীও তাঁর সন্তানকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিতে পারেন,

যেমন হয়েছে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। মানুষ হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা—এই নীতিকে কেন্দ্র করে যার শিক্ষার আয়োজন, তাকে কোনও দুর্বলতা বা স্বার্থপরতা স্পর্শ করতে পারে না। নিবেদিতা বলেছেন, মানুষ একা নিজের জন্য জীবনধারণ করে না। যে-অনুপাতে আমরা এটি উপলব্ধি করি, সেই অনুপাতে আমাদের জীবন মহান হয়ে ওঠে। যে-অনুপাতে এটি আমাদের প্রেরণা হয়, সেই অনুপাতে আমাদের শিক্ষা প্রকৃত হয়।

কোনও জাতির শিক্ষাপরিকল্পনা রচনার আগে সেই জাতির জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও ধৈর্যশীল অনুশীলনের প্রয়োজন বলে নিবেদিতা মনে করতেন। শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ভাবের অনুকূল হলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়, চরিত্রগঠনের পাশাপাশি জাতিগঠনের সহায়ক হয়। তাঁর কাছে জাতীয়তার অর্থ—সবার উপরে অন্যের জন্য বোধ করা। তিনি মনে করতেন, জাতিগঠনের জন্য সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি হল শিশুর সামনে তার বয়োজ্যেষ্ঠদের সুদৃঢ় নাগরিকবোধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা ও নিজেদের চেয়ে সাধারণের মঙ্গলচিন্তায় আগ্রহী আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ওঠা। জাতীয় শিক্ষা প্রথমত ও প্রধানত হল জাতীয় আদর্শশিক্ষা। সাহিত্য ও ইতিহাসের পরিচিত উপাদানগুলি দিয়ে এই শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু তার ব্যাপ্তি হবে যা-কিছু সত্য, সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন তার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে। কোনও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়নের স্তর যা-ই হোক না কেন, একেই নিবেদিতা স্বাস্থ্যকর শিক্ষার প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে নিবেদিতা গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদেশি ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি, তবে শিক্ষায় বিদেশি সংস্কৃতির স্থান কখনই প্রারম্ভে হতে পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। শিশু যখন প্রথম চিন্তা করতে শেখে, নিত্য নতুনভাবে জগতকে আবিষ্কার করতে শেখে, স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা দিয়ে নিজেকে সৃজনমুখী করে তুলতে প্রয়াসী হয়, তখন মাতৃভাষাই তার ভাব গ্রহণ ও প্রকাশের একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তার ইতিহাসজ্ঞান, ভৌগোলিক চেতনা দেশের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হওয়ার পথ খুঁজে নেয়। সকল যথার্থ বিকাশ জানা থেকে অজানায়, অতি পরিচিত থেকে অপরিচিততে, কাছ থেকে দূরে এগিয়ে যায়। নিবেদিতা বলেছেন, ‘‘যখন পরিচিতের মূল গভীরভাবে প্রোথিত, শুধু তখনই আমরা নিরাপদে অপরিচিতকে গ্রহণ করতে পারি। যত আমরা পরিচিতকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করব, ব্যক্ত আদর্শ ও গৃহীত আঙ্গিকের মধ্যে এমনকী পরিচিতের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যকেও বিশ্লেষণ করব, ততই সেটি আমাদের জন্য সমগ্র জগতের গ্রন্থটি উন্মুক্ত করে দেবে।’’

ফ্রয়েবেল যে-সক্রিয়তাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে খেলাকে শিক্ষার এক আবশ্যিক মাধ্যম বলে নির্দেশ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করে নিবেদিতা বলেছেন, জীবজগতের সকলের মতোই মানবশিশুও তার জীবনের শুরু থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে থাকে। এভাবেই সে বিছানায় উপুড় হতে, হামা দিতে, হাঁটতে, কথা বলতে শেখে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রচেষ্টা সৃজনে, ধ্বংসে, একাকী বা দলবদ্ধ ক্রীড়ায় নিজেকে বিকাশের পথ খুঁজে পায়। অন্তর্নিহিত শক্তির এই স্বেচ্ছাবৃত প্রচেষ্টাই খেলা, যা ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়মেই এক সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের পথে চালিত করে। নিবেদিতা বলেছেন,

''সারা জগতকে শিশুর বিদ্যাগৃহে পরিণত করার এই হচ্ছে প্রকৃতির পথ। সে এইভাবে ভাবী রাজার হাতে রাজদণ্ড তুলে দেয়। প্রকৃতি ভুল করে না।... বালকের আগ্রহ কখনও কমে না। স্বাস্থ্যজনক পরিপাকের পূর্বে যেমন ক্ষুধা, তেমনি এইসকল শিক্ষার সঙ্গে থাকে আনন্দ। মনোযোগ ঘনীভূত হয়, সমগ্র সত্তা অভিনিবিষ্ট হয়।''

নিবেদিতা নিজে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিকে শিশুশিক্ষার আদর্শ পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় স্কুলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে ভারতবর্ষ যা করেছে, কিন্ডারগার্টেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ তা করার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানের স্তরে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গাথা ও ব্রতগুলি যেমন কাহিনি, বিষয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে, কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর মনকে বিজ্ঞানের জ্ঞানে নিবেশিত করার জন্য গৃহীত খেলাভিত্তিক কর্মগুলি তার অনুরূপ। পেস্টালৎসি, ফ্রয়েবেল, কুক সকলেই মনে করেন, স্বাভাবিক জ্ঞান এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতাই শিশুর চরিত্র গঠন করে। নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় এর সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচ্য সর্বদাই শিশুর অন্তর্জগতের উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে, আর পাশ্চাত্য তার হাতে তুলে দিয়েছে উন্নততর জীবনযাপনের বস্তুজাগতিক হাতিয়ার। উভয় সভ্যতারই সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠা প্রয়োজন—এই ছিল তাঁর মত।

ভারতবর্ষের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতা এই কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিকে মান্যতা দিলেও তাকে হুবহু বিদেশি ছাঁচে গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বস্তুত তিনি মনে করতেন, এই পদ্ধতি এতটাই সূক্ষ্ম যাকে হুবহু অনুকরণ করতে গেলে তা যান্ত্রিক হয়ে উঠবে, শিক্ষার পদ্ধতি না হয়ে লক্ষ্যের অভিমুখী একটি গতে বাঁধা পথ হয়ে উঠবে। এমনকী ইউরোপের কিন্ডারগার্টেনগুলির মধ্যেও পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি, নির্দিষ্ট উপকরণগুলির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তফাত চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা অনিবার্য। নিবেদিতার মতে, ভারতীয় শিক্ষাদাতা ছাড়া অন্য কেউ ভারতীয় কিন্ডারগার্টেন তৈরি করতে পারবে না। কারণ, পদ্ধতির অন্তর্গত উপাদানগুলিকে হতে হবে ভারতীয়, সমগ্র ব্যবস্থাটিকে হতে হবে ভারতীয় জীবনের মূল নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, তিনি বম্বের একজন শিক্ষক মি. চিচ্‌গার-এর নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি নিবেদিতার অনেক আগে থেকেই কিন্ডারগার্টেনের ভারতীয়করণের চেষ্টা করে সফল হয়েছেন।

কিন্ডারগার্টেনের উপহার ও নির্মাণকর্মের জন্য প্রদত্ত উপকরণগুলির ভারতীয় রূপ কেমন হবে নিবেদিতা তারও আভাস দিয়েছেন। যেমন, শিশুকে যে-উজ্জ্বলবর্ণের নরম বল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার জায়গায় ভারতীয় শিশুকে উলের আবরণে ঢাকা ন্যাকড়ার বল দেওয়া যেতে পারে। নির্মাণকার্যের জন্য ফ্রয়েবেল যে-কাঠের তৈরি সামগ্রীগুলি দিয়েছেন, তা ভারতীয় শিশুর সাধ্যের বাইরে। তার জায়গায় পোড়ামাটির অনুরূপ জিনিস দেওয়া যেতে পারে। সংখ্যা গণনার জন্য বিভিন্ন সংখ্যক বাদাম বা বীজের ছোট ছোট মালা তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিবেদিতার বিশ্বাস, ''খেলার জন্য রাস্তায় শিশুকে ছেড়ে দিলে সে তার চারপাশের জীবনকে অনুকরণ করে নিজের জন্য এক আদর্শ কিন্ডারগার্টেন সহজেই সৃষ্টি করতে পারে।''

নিবেদিতা কিন্ডারগার্টেনের খেলাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রচলিত গল্পকথা বা ব্রতকথার অনুসারী নাটকীয় উপস্থাপনায়—যেখানে গান

থাকবে, গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচের অঙ্গভঙ্গি, কখনও হাতে হাত মিলিয়ে তৈরি করা বেষ্টনী, হাতে তালি কিংবা লাফ-ঝাঁপ। নিবেদিতা এ-প্রসঙ্গে মাদ্রাজের মিসেস ব্রান্ডার-এর উল্লেখ করেছেন, যিনি তামিলভাষী শিশুদের জন্য ছড়া সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলি দিয়ে শিশু-উদ্যানের সহজ খেলার উপকরণ তৈরি করেছেন। বাংলা ভাষার অতিপরিচিত 'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই' ছড়াটি ও তৎসহ শিশুর বিশেষ অঙ্গসঞ্চালন নিবেদিতার মতে বিশুদ্ধ কিন্ডারগার্টেন খেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

মূর্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি লিখিত ভাষার ব্যবহার, গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব কিন্ডারগার্টেনের গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কিন্ডারগার্টেনে নিবেদিতা ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শেষোক্ত বিষয়টির তাৎক্ষণিক উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি ভেবেছিলেন, যাতে পড়াশোনার শেষে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎজীবনে গৃহে থেকেই মর্যাদাকর কোনও জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়।

একটি শিশুর কিন্ডারগার্টেনের কাল বড়জোর আট বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর মাধ্যমিক স্তরে তাকে প্রস্তুত হতে হয় বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের জন্য। এই প্রস্তুতির শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতা মোটামুটি সেই সময়কার সরকারি শিক্ষানীতির অনুসারী মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাইস্কুল স্তরে তাঁর সমকালে প্রচলিত সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা তাঁর পছন্দ না হলেও এর প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ, এটি এমনই একটি আধুনিক ভাষা, যা বহু ভাষা ও সংস্কৃতিতে পৌঁছবার চাবিকাঠি। এই পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের একটি সহজ এক বছরের কোর্স উপযুক্ত যন্ত্রপাতিসহ অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন নিবেদিতা, যাতে আধুনিক জগতের একজন শিক্ষিত মানুষ নিজের হাতদুটির ব্যবহার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মূল নীতিগুলি শিক্ষা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ডা. হ্যানফোর্ড হেন্ডারসনকে উদ্ধৃত করে নিবেদিতা বলেছেন, বুদ্ধির উন্নয়নের পরিকল্পনারূপে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা লেখাপড়ার জীবিকায় যেতে ইচ্ছুক তাদেরও এই শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য প্রচলিত বৃত্তিগুলির বুদ্ধিগত উৎকর্ষসাধন, যে-দক্ষতা আছে তাকে বিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচালন, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে হাতে-কলমে তা প্রয়োগের সুযোগ-সৃষ্টি এবং প্রাচীন ও বর্তমান সভ্যতার যথার্থ তুলনা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার অভিজ্ঞতা অর্জন।

শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতার চিন্তাভাবনা যতটা ব্যাপক, তাকে কার্যকর করে তোলার মতো সময় তিনি তাঁর বহুমুখী কর্মময় অথচ স্বল্পকালীন জীবৎকালে বিশেষ পাননি। তবু এরই মধ্যে তিনি ভারতের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৮৮১-৮২ সালে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন হান্টার কমিশন ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার সুপারিশ করা সত্ত্বেও দেশে নারীশিক্ষায় তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। এর জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতার দায় যত না, তার চেয়ে বেশি ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারগুলির সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। একথা মনে রেখে নিবেদিতা তাঁর স্কুলে নারীশিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। যে-তীব্র সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি তাঁর কিন্ডারগার্টেনের শিশু শিক্ষার্থীদের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করতেন, সেই মন নিয়েই হিন্দু নারীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

স্কুলে তিনি হিন্দুদের পরিবেশ কঠোরভাবে রক্ষা করতেন। নিজে হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর মতো শুদ্ধ জীবনযাপন করতেন। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূরা যাতে পর্দাপ্রথা অক্ষুণ্ণ রেখে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারে, তার জন্য ঢাকাগাড়ির ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রীদের মধ্যে বিশ্বচেতনা, তথ্যনিষ্ঠা ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি গড়ে তোলাকেও নিবেদিতা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেইযুগেও স্কুলে মেয়েদের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন, মাইক্রোস্কোপ, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করেছেন। ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছেন। তাদের আরও সুযোগ দিতে স্কুলের উন্নতির জন্য আমেরিকায় ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। অনাথ হিন্দু বিধবা মেয়েদের সামাজিক অসহায়তা লক্ষ করে রক্ষণশীলতার আড়ালটুকু বজায় রেখে জ্ঞানমূলক শিক্ষার পাশাপাশি সেলাই, হাতের কাজ, শিশু ও নারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গৃহ-উদ্যোগে আচার, চাটনি, জ্যাম তৈরি করে ইংল্যান্ড, ভারত, আমেরিকায় তার সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন, যাতে তারা সম্মানজনক উপার্জনের পথ বেছে নিতে পারে।

ভারতীয় নারীর শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে নিবেদিতার চিন্তাধারা সমকালীন সমাজতত্ত্ববিদদের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় নারীকে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গনে নিয়ে আসতে হলে তাকে ইংরেজি বলতে ও লিখতে শেখানোই যথেষ্ট নয়। জগতের আদর্শ হয়ে ওঠার জন্য নারীর যে-সমীকরণটি প্রয়োজন তা হল, প্রাচ্য নারীর সুকোমল হৃদয়বৃত্তিগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বৌদ্ধিক সংযম ও সমৃদ্ধ তথ্যজ্ঞানের সংযুক্তি : "Severe intellectual discipline and anxious knowledge of facts must be added to the delicate grace and deep mother wisdom of the oriental woman." নিবেদিতার শিক্ষাদর্শ নারীকে তার পারিবারিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আর পুরুষের সমান অধিকারলাভে সীমাবদ্ধ করে না। বরং পারিবারিক শান্তি ও স্থায়িত্বের কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রেখে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জাগরণ ঘটায়, যা তাকে একইসঙ্গে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সত্তায় উত্তীর্ণ করে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুশীল রায়, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, (সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৯১)

২। গৌরদাস হালদার, *শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস*, (ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৭)

৩। *শিক্ষাচিন্তা : রবীন্দ্র রচনা সংকলন*, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৯)

৪। জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিংশ শতকে ভারতীয় শিক্ষা*, (সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৯৯০)

৫। *উদ্বোধন*, ১১৮ বর্ষ, পৃঃ ১২২

৬। সম্পাদক : গোপাল হালদার, *নিবেদিতা রচনা সমগ্র*, (বইপত্র, ১৯৭৭), খণ্ড ১

৭। *নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা*

৮। *উদ্বোধন, স্বামীজী সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৪২০*